বিজয়ের নৈতিক মূল্যবোধ ও বাঙালীর স্বপ্ন গন্তব্য

ফকির ইলিয়াস

যে চেতনা, স্বপ্ন এবং প্রত্যাশার লক্ষ্যে স্বাধীন বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটির অভ্যুদয় হয়েছিল তা আজ কতোটা বাস্তবতার পরশ পেয়েছে, সে প্রশ্নটি উত্থাপিত হচ্ছে বার বার। তেত্রিশ বছর একটি জাতি এবং রাষ্ট্র পুনর্গঠনে কম সময় নয়। রাষ্ট্রের রাজনীতিকরা চাইলে অনেক কিছুই হতে পারতেন। কিন্তু হয়নি। কেন হয়নি সে প্রশ্নের জবাব কারোই অজানা নয়।

বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটির মৌলিক মূলনীতি ছিল গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং জাতীয়তাবাদ। একটি দেশে গণতন্ত্রের পাশাপাশি সমাজতন্ত্র চলতে পারে কি না তা নিয়ে প্রশ্ন ছিল। তারপরও উনসত্তর - সত্তর - একাত্তরে জাতীয় রাজনৈতিক ঐক্যমত্যের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল ঐ চার মূলনীতির পক্ষে। যার উপর ভিত্তি করে সংগঠিত হয়েছিল মহান মুক্তিযুদ্ধ।

এটা খুবই হতাশা এবং দুঃখের কথা, যে চেতনা নিয়ে মহান মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয়েছিল, স্বাধীনতা অর্জনের পর সে চেতনা আর রাষ্ট্র পরিচালকদের মাঝে সমুন্নত ছিল না। যার ফলেই পরাজিত মধ্যসত্ত্বভোগী গোষ্ঠীটি সুযোগ মতো তাদের ছোবল দিতে তৎপর ছিল। 'একশ এক' টাকা কিংবা এক হাজার এক' টাকায় রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি কাউকে দান করে দেয়ার রেওয়াজ বিশ্বের অন্য কোন দেশে আছে কি না - তা আমার জানা নেই। কিন্তু শুধুমাত্র বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটিতেই গেল তেত্রিশ বছরে অনেক মূল্যবান ভবন, হাজার হাজার একর পতিত জমি, খাসভূমি উদ্যান, নামমাত্র মূল্যে বিলি বন্টন করে নিয়েছেন রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রক পরিচালকরা। কতোটা মগের মুল্লুক মনে করলে এমনটি করা যেতে পারে তা ভাবলে গা শিউরে উঠে। কিন্তু রাষ্ট্রের জনগণ এতোই অসহায় যে তারা প্রতিবাদ তো দূরের কথা 'রা' শব্দটি পর্যন্ত করেন না। কিংবা করতে পারেন না।

ভেবে অবাক হতে হয় দেশের প্রতিটি সরকারই গেল তেত্রিশ বছর বিভিন্ন জনগুরুত্বপূর্ণ ইস্যুগুলোতে মনোযোগী না হয়ে বরং চেপে গেছে। সন্ত্রাস, দুর্নীতি, রাজনৈতিক নিপীড়ন এগুলোর মতো বড় ইস্যুর কথা যদি বাদই দিই তবে তো রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণে সরকারের কোন দায়িত্ব থাকে না। তারপরও আছে আরো অনেক ছোট ছোট জনগুরুত্বপূর্ণ ইস্যু। বাংলাদেশে লঞ্চ-স্টীমার ডুবি'র মতো একটা ভয়াবহ ঘটনা ঘটে প্রায় প্রতি বর্ষা মৌসুমে। পত্র-পত্রিকার ভাষ্য অনুযায়ী প্রায় প্রতি বছরই লঞ্চ-স্টীমার ডুবি'র ঘটনা ঘটে বাংলাদেশে। সহস্র-সহস্র লোকের প্রাণহানি ঘটে। পরিতাপের বিষয় এর কোন তদন্ত হয় না। লঞ্চ-স্টীমার- জাহাজ নিয়ন্ত্রণ বিধি বলে কোন নিয়ম কানুন নেই।

বাংলাদেশের প্রতিটি সেক্টরই এক একটি মিনি স্বৈর কেন্দ্র। চিকিৎসা, শিক্ষা, ব্যাংকিং, ডাক, তার-টেলি, সড়ক, পরিবহন সব কটি গণ প্রয়োজনীয় সেক্টরই নিয়ন্ত্রণ করছে এক একটি স্বৈর পেশীশক্তি। কোন রোগী হাসপাতালে ভর্তি হলে আগে তার পকেট গুণে দেখার চেষ্টা করা হয়। রোগীটি ধনী না গরীব। ধনী হলে তাকে চিকিৎসকদের পছন্দ মতো (যেগুলো নেপথ্য পার্টনার তারা নিজেরাই) ক্লিনিকে ভর্তির উপদেশ (!) দেয়া হয়। আর রোগীটি গরীব হলে তার স্থান হয় হাসপাতালের বারান্দায়। একই অবস্থা শিক্ষা ক্ষেত্রেও। মন্ত্রী-আমলা - বড় কর্তাদের সন্তানদেরকে লেখাপড়ার জন্য পাঠানো হয় বিদেশে। আর গরীব মধ্যবিত্তদের সন্তানদেরকে রাজনীতিকরা ব্যবহার করেন তাদের হাতিয়ার হিসেবে। শিক্ষকরা পরামর্শ দেন প্রাইভেট কোচিং সেন্টার, প্রাইভেট স্কুল কলেজে ছাত্রছাত্রীদেরকে ভর্তি হবার। বৈষম্য আর কতোটা নগ্ন হতে পারে? বাংলাদেশের ব্যাংকিং সেক্টরটিও এখন দখল হয়ে গেছে রাজনীতিকদের দ্বারা। বড় বড় সরকারী, বেসরকারী ব্যাংকগুলোর পরিচালক নিয়োগপ্রাপ্ত হন রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে। ডাক ব্যবস্থার কাছে জিম্মি দেশের মানুষ। তার ও টেলি যোগযোগের ক্ষেত্রে ও

রাজনৈতিক আধিপত্য চরম অবস্থা বিরাজকরেছে সব সময়। যুক্তরাষ্ট্রের এটিএন্ডটির মতো বৃহৎ বাণিজ্যিক টেলি কম্যুনিকেশন কোম্পানীটি বার বার আবেদন করেও বাংলাদেশে বাণিজ্য প্রসারের সুযোগ পায়নি। মার্কিন এটিএন্ডটি সংস্কারের মাধ্যেমে গোটা বাংলাদেশে আধুনিক ল্যান্ড ফোন সিস্টেম পৌছে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু বাংলাদেশের টিএন্ডটির চরম বিরোধিতার কারণে তা সম্ভব হচ্ছে না।

বাংলাদেশের সড়ক ব্যবস্থা, রেল যোগাযোগ এখনো ধারণ করে আছে শত বছরের দারিদ্র। লোক দেখানো আইওয়াশের মতো কিছু উন্নয়ন হলেও এখনো বৃষ্টির পানিতে ডুবে যায় রাজধানী ঢাকা শহর। মন্ত্রীরা গাড়ি হাঁকাতে পারলেও জনসাধারণরা হেঁটেও পথ চলতে পারেন না। তার উপর অপরিকল্পিতভাবে গড়ে উঠছে রাজনৈতিক নেতা ও তাদের দোসরদের ভবন-দালান। দখল হয়ে যাচ্ছে লেক, পার্ক, নদীর চর, এমন কি কখনো কখনো নদীও। যারা ক্ষমতায় থাকছে তাদের নেতা কর্মীরাই ভোগ করছে বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটিকে।

পত্র-পত্রিকার রিপোর্ট অনুযায়ী পবিত্র ঈদুল ফিতর ২০০৪ উপলক্ষে বাংলাদেশে আঠারো হাজার কোটি টাকার ব্যবসা বাণিজ্য হয়েছে। তাহলে দেশটির গায়ে দারিদ্র্যের ছাপ কোথায়? কে বলবে বাংলাদেশ গরীব দেশ? হ্যাঁ, দারিদ্র জড়িয়ে আছে দেশের পাঁজরে, অস্থি, মজ্জায়। কয়েক হাজার পরিবার ধনাঢ্য ব্যক্তিত্বের উত্থান হলেও অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে দরিদ্র করে রাখা হয়েছে আপামর জনসাধারণকে। মৌলিক উন্নয়নের কোন ছোঁয়া রাষ্ট্রের কাঠামোতে লাগেনি।

নায্য ইস্যু নিয়ে চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে কিছু বললে তারা ধর্মঘটের হুমকি দেন। শিক্ষক, বৈমানিক, ব্যাংকার, কর্মকর্তারা, শ্রমিকসহ প্রায় প্রতিটি সেক্টরের মানুষের এক অনন্য শক্তি হচ্ছে তারা কর্ম বয়কট করবেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হচ্ছে তারা নিজেরা নিজের আয়নায় নিজের চেহারা দেখেন না। নৈতিক মূল্যবোধ জাগ্রত না হলে দেশপ্রেম প্রতিষ্ঠা হয় না। আর দেশপ্রেম প্রতিষ্ঠিত না হলে দেশের কল্যাণে কাজ করার মানুষ খুঁজে পাওয়া যায় না।

প্রতিটি জাতির প্রবাসীদের দেশপ্রেম অনন্য। তার কাণে তারা দেশের বাইরে থেকেও দেশের প্রকৃত অবস্থা অনুধাবন করতে পারেন। বাংলাদেশের প্রবাসীরা কোটি কোটি ডলার বৈদেশিক মুদ্রা দেশে পাঠান। আর নিজেরা দেশে গিয়ে সামান্য সামাজিক নিরাপত্তাটুকুও পান না।

বাঙালী জাতির বিজয়ের স্বপ্ন ছিল। বিজয় এসেছে। কিন্তু পরাজয়ের মৌন ধারাবাহিকতায় ক্রমশঃ ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে সেই স্বপ্ন সৌধ। বলতে দ্বিধা নেই যদি একজন প্রকৃত দেশপ্রেমিক নেতা কিংবা নেত্রী কঠোর হয়ে বাংলাদেশের হাল ধরতেন তবে আজকের প্রেক্ষাপট ভিন্ন রকম হতো।

বাঙালীর সামনে এখন আর বিশেষ কোন স্বপ্ন গন্তব্য নেই। শুধু আছে একটি পরিশুদ্ধ, ইতিহাস অন্বেষী প্রজন্ম গঠনের প্রত্যয়। যারা সত্যের উপর শক্তিশালী বুক নিয়ে দাঁড়াবে। বাঙালী জাতি যদি এই স্বপ্নটি পুরণেও ব্যর্থ হয় তবে জাতির যাযাবরত্ব আরো দীর্ঘায়িত হতে পারে। স্বপ্ন এখন একটিই এই প্রজন্ম জাগবে। ভেঙ্গে দেবে কালো আঁধারের লৌহ দরোজা।

নিউইয়র্ক। ডিসেম্বর ০১ , ২০০৪